# গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে বিচারিক হয়রানি নিয়ে বিশ্বের শতাধিক নোবেল লরিয়েট ও অন্যান্য বিশ্ব নেতাদের প্রেরিত খোলা চিঠির প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এ  প্রচারিত বিবৃতি বিষয়ে গ্রামীণ টেলিকমের বক্তব্য।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস সম্পর্কে Ministry of Foreign Affairs থেকে যে বক্তব্য ছাপা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে গ্রামীণ টেলিকমের বক্তব্য নিম্নে দেয়া হলো।

**প্রেক্ষাপটঃ**

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের দরিদ্র অসহায় মানুষ বিশেষত: অতি দরিদ্র নারীদেরকে অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর দারিদ্রতা থেকে স্থায়ী ভাবে মুক্তির লক্ষ্যে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন এবং সেই লক্ষ্যে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ববাসী হতবাক হয়ে দেখলেন একটি গরীব দেশের যে দরিদ্র নারী গোষ্ঠী উক্ত ঋণকে পারিবারিক ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় কাজে লাগিয়ে সামাজিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৯৭% ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা অর্জন করেছে। এই অসাধারণ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৬ সালে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক যৌথ ভাবে শান্তিতে নবেল পুরস্কার অর্জন করেন। অত:পর ড. ইউনূস তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করলেন বিশ্বের সকল দেশ সমূহের বিরাজমান দারিদ্রতাকে কিভাবে দূর করা যায়। তিনি পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ ধনী ও গরীব দেশসমূহ ভ্রমণ করে দেখতে পান যে ঐসকল দেশসমূহের দারিদ্রতার চেহারা ও অভাব অনটনের চিত্র ও লক্ষণ প্রায় একই রকম। আবার উহার সাথে প্রতি বছর যুক্ত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার যুবকদের চাকুরীর সমস্যা। তিনি ভাবলেন কোন প্রকার দান বা অনুদান দিয়ে এর কোন স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এর কোন সমাধান নাই। কারণ এই পুজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ যার কোন সম্পদ নাই ও মর্টগেজ দেওয়ার ক্ষমতা নেই তাদেরকে ব্যবসার জন্য কোন ঋণ সহায়তা প্রদান করে না। এ অবস্থা দেখে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সামাজিক ভাবে ব্যবসা কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবলমাত্র বিশ্বের দারিদ্রতা ও বেকারত্বের সমস্যার সমাধান সম্ভব। কারণ বেকার শিক্ষিত যুবকদেরকে যদি ব্যবসার মধ্যে যুক্ত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া যায় তাহলে তাদের পরিবারও দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পাবে এবং

উক্ত ব্যবসার মাধ্যমে নতুন কাজের সৃষ্টি হবে। তাই তিনি বিশ্বব্যাপী দারিদ্রতা দূরীকরণ ও শিক্ষিত যুবকদের বেকার  সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য এক নতুন অর্থনৈতিক চিন্তা ধারার রূপ দেখা তুলে ধরেন যার নাম হচ্ছে "সামাজিক ব্যবসা" (Social Business)। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ৩০৩টি ইউনূস সেন্টারের মাধ্যমে তিনি তার "সামাজিক ব্যবসা" (Social Business) কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশই ড. ইউনূসের এই "সামাজিক ব্যবসা" (Social Business) কার্যক্রম গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বিশ্বে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। "সামাজিক ব্যবসা"( Social Business) এর মূল লক্ষ্য হলো বেকার যুবক সমাজ যেন চাকুরীর পিছনে অহেতুক সময় নষ্ট না করে গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে সম্ভব হলে নিজেদের সংগ্রহকৃত অর্থে অথবা সমাজের বিত্তবান যাহারা সমাজ ও তথা দেশের মঙ্গল চায় তাহাদের নিকট হতে বিনিয়োগকৃত অর্থ সংগ্রহ করে স্বস্ব দেশের আইন মোতাবেক বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক লাভজনক ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। অত:পর ব্যবসার লভাংশ থেকে তারা মুনাফা ব্যতীত বিনিয়োগকারীর গ্রহণকৃত অর্থ তাকে ফেরৎ দিবে এবং ব্যবসায় নিয়োজিত সকল পরিচালনাকারী ব্যক্তিবর্গ ও কাজে যোগদানকারী সকল সদস্য বা ব্যক্তি তাদের বেতনের টাকা ব্যতীত কোন লভ্যাংশ গ্রহণ করিবে না। উক্ত লভ্যাংশ দিয়ে নতুন নতুন ব্যবসা গড়ে তোলা হবে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এভাবে ক্রমাগত ভাবে "সামাজিক ব্যবসা" (Social Business) সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দারিদ্রতা দূরীকরণ ও বেকারত্বের স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের দারিদ্রতার স্থায়ী সমাধান ও বেকারত্ব নিরসনের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ড. ইউনূস বাংলাদেশের মধ্যে প্রায় ৫০ টির মত সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী গড়ে তোলেন যাতে করে বিশ্ববাসীর নিকট এই প্রতিষ্ঠান গুলোকে "সামাজিক ব্যবসা" (Social Business) এর মডেল হিসেবে দাঁড় করানো যায়। এই প্রতিষ্ঠান গুলোর সকল কার্যক্রম গ্রাম ভিত্তিক। গ্রাম অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন, বস্ত্র, বিদ্যুৎ বিহীন গ্রামে গ্রামে সোলারের মাধ্যমে বিদুৎ বিতরণ, মৎস্য ও পশুপালন, ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ কেলডনিয়ান কলেজ অব নার্সিং প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বমানের নার্স গড়ে তোলাসহ আরও অন্যান্য বিভিন্ন সেক্টরে সফলতার সাথে কাজ করছে। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে গ্রামীণ টেলিকম।

**কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রামীণ টেলিকমরে বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বি,এল,এ (ফৌজদারী) মামলা নং- ২২৮/২০২১ এর বিবরণঃ**

গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানী আইনের ২৮ ধারায় সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান (নট ফর প্রফিট কোম্পানী)। কোম্পানী আইন অনুযায়ী যার লভ্যাংশ বিতরণযোগ্য নয় বিধায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে নীট মুনাফার ৫% WPPF প্রদান করার কোন সুযোগ নেই। উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত থকার কারণে

দীর্ঘ ১০ বৎসর যাবৎ গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীগণ চাকুরীতে থাকাবস্থায় এবং রিটায়ারমেন্টে যাবার পরও তারা কখনো WPPF দাবী করে নাই। সাম্প্রতিক কালে WPPF এর সুবিধা আদায়ের জন্য গ্রামীণ টেলিকমের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সিভিল বিধানের অধীন ২১১ ধারায় ২০১৭ সালে ৩য় শ্রম আদালতে অনেক গুলো সিভিল বি.এল.এ (আই,আর) মামলা, সিবিএ কর্তৃক শিল্প বিরোধ মোকদ্দমা নং ১৬৬৬/২০১৯ দায়ের করে। কিন্তু সরকারের কলকারখানা প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর গ্রামীণ টেলিকমের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উক্ত অযৌক্তিক ও আইন বহির্ভূত দাবী দাওয়া থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরত রাখার পরিবর্তে ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক ভাবে গ্রামীণ টেলিকম সম্পর্কে ভুল ও মিথ্যা তথ্যের অবতারনা করে WPPF সহ টেলিকমের অবৈতনিক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসহ চার জন পরিচালকের বিরুদ্ধে বি,এল,এ(ফৌজদারী) মামলা নং- ২২৮/২০২১ দায়ের করে ৩০৩ (ঙ) এবং ৩০৭ ধারায় শাস্তি দাবী করে। অভিযোগ সমূহ
নিম্নরূপ:

**অভিযোগ নং ০১: চাকুরী স্থায়ীকরণ না করা।**

ধারা ৪(৭)(৮): প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীদের শিক্ষানবীশকাল সমায়ান্তে আইনের বিধান অনুযায়ী স্থায়ীকরণ করা হয়নি।

**গ্রামীণ টেলিকম যা করেছে:**

গ্রামীণ টেলিকমের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ নীতিমালা অনুযায়ী চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়। কারণ গ্রামীণ টেলিকম যে সকল ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে সেগুলো চুক্তি ভিত্তিক এবং নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে তা নবায়নের মাধ্যমে পরিচালনা করে। নোকিয়া কেয়ার, হুয়াওয়ে কেয়ার এবং পল্লীফোন কার্যক্রম ৩ বছরের চুক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং ৩ বছর পর আবার চুক্তি নবায়ন করে তা পরিচালনা করা হয়। যেহেতু গ্রামীণ টেলিকমের কার্যক্রম উপরোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে, সেজন্য গ্রামীণ টেলিকমের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তবে গ্রামীণ টেলিকমের ব্যবসায়িক চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে সাথে অনুরূপ ভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চুক্তির মেয়াদও বৃদ্ধি করা হয়েছ্।গ্রামীণ টেলিকমের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে স্থায়ী কর্মীর মতোই প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুয়িটি, অর্জিত ছুটি, অবসরকালীন ছুটিসহ সবই প্রদান করা হয়ে থাকে।

**আমাদের মন্তব্য :** ধারা- ৪(৮) তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষানবিশকাল শেষে বা তিন মাস মেয়াদ বৃদ্ধির পর কনফারমেশন লেটার দেওয়া না হইলেও উপ-ধারা (৭) এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শ্রমিক স্থায়ী বলিয়া গণ্য হইবে। যেহেতু শ্রম আইনের মধ্যে উক্ত লংঘনের প্রতিকার দেয়া

আছে। ফলে উহা কোন ভাবেই ফৌজাদরী অপরাধ নয়। শ্রম আইন অনুযায়ী উহা প্রশাসনিক ও সিভিল মোকদ্দমার বিষয়।

**অভিযোগ নং ০২: বাৎসরিক ছুটি নগদায়ন প্রসঙ্গে**

ধারা-১১৭ বিধি ১০৭ : মোতাবেক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীদের আইনের বিধান অনুসারে মজুরীসহ বাৎসরিক ছুটি প্রদান, ছুটি নগদায়ন ও ছুটির বিপরীতে নগদ অর্থ প্রদান করা হয় না।

গ্রামীণ টেলিকম যা করেছে :

- গ্রামীণ টেলিকমের অর্জিত ছুটি সংক্রান্ত নীতিমালা ২০০২ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ১লা জানুয়ারী ১৯৯৭ সাল থেকে কার্যকর করা হয়েছে। যদিও শ্রম আইন ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত।

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ধারা ৩(১) অনুযায়ী " প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা থাকিতে পারে। তা শ্রম আইনে সুবিধা হতে কম হতে পারবেনা "।

- গ্রামীণ টেলিকমের নীতিমালায় বছরে ৩০ দিন অর্জিত ছুটির বিধান রেখে ছুটি নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে, যেখানে শ্রম আইন অনুযায়ী প্রতি ১৮ কর্ম দিবসের জন্য ১ দিন সেই হিসেবে গস্থামীণ টেলিকমের ক্ষেত্রে গড়ে বছরে সর্বোচ্চ ১৪ দিন অর্জিত ছুটি সাধারণত সকল কর্মী প্রাপ্য হন। অর্থাৎ আমরা শ্রম আইনের সুবিধার চেয়ে অধিক হারে অর্জিত ছুটি প্রদান করে থাকি।

- গ্রামীণ টেলিকমের অর্জিত ছুটি নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রতি ৩ বছরে ৩০ দিনের ছুটি নগদায়ন করতে পারবে এবং ৬০ দিন ছুটি জমা রাখতে পারবে।

- ছুটি নগদায়নের ক্ষেত্রে শ্রম আইনে গ্রামীণ টেলিকমের ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রতি বছরে ১৪ দিন পেয়ে থাকে যার ৭দিন নগদায়ন হবে এবং বাকী ৭দিন জমা থাকবে। আর গ্রামীণ টেলিকমের প্রচলিত ছুটি নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি ৩ বছরে ৩০ দিন ছুটি নগদায়ন করে থাকে। অর্থাৎ বছরে গড়ে ১০ দিন নগদায়ন হচ্ছে। এই নগদায়নের ক্ষেত্রে শ্রম আইনের চেয়ে বেশি দেয়া হয়েছে।

**আমাদের মন্তব্য :** ১১৭(৭) ধারায় উল্লেখ আছে যে কোন শ্রমিক অর্জিত ছুটির জন্য দরখাস্ত করিলে যদি মালিক কোন কারণে উহা না-মঞ্জুর করেন। তাহা হইলে উক্ত না মঞ্জুরকৃত ছুটি

সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের মূল অর্জিত ছুটির সাথে অতিরিক্ত পাওনা হিসাবে যুক্ত হবে। যেহেতু শ্রম আইনে উহার প্রতিকারের বিধান আছে। তাই ইহা কোন ভাবেই ফৌজদারী অপরাধ নয়। শ্রম আইন অনুযায়ী উহা প্রশাসনিক ও সিভিল মোকদ্দমার বিষয়।

উল্লেখ্য যে গ্রামীণ টেলিকমে বাৎসরিক ছুটি নগদায়ন ১৯৯৭ সাল থেকে চালু করা আছে যা শ্রম আইনের চেয়ে অধিক। পরবর্তীতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নির্দ্দেশে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০২১ইং তারিখের বোর্ড সভায় শ্রম আইন মোতাবেক প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়,যা ১লা জানুয়ারী ২০২১ইং থেকে কার্যকর করা হয়েছে। বিষয়টি গত ২৯/০৮/২০২১ইং তারিখে পত্রের মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে জানিয়ে দেয়া হয়, অথচ এ বিষয়ে তারা ৯.৯.২০২১ইং তারিখে মামলা করেছে।

**অভিযোগ নং ০৩ :** অংশ গ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল শ্রম আইন ২৩৪ ধারা অনুযায়ী কমিটি গঠন :

ধারা-২৩৪ অনুযায়ী শ্রমিক অংশ গ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয় নাই এবং নীট লভ্যাংশের ৫% উক্ত দুটি তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬ অনুযায়ী গঠিত তহবিলে নির্দিষ্ট হারে প্রদান করা হয়নি।

## গ্রামীণ টেলিকম যা করেছে :

গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানী আইনের ২৮ ধারায় সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান এর লভ্যাংশ বিতরণ যোগ্য নয় বিধায় নীট প্রফিটের ৫% WPPF প্রদান করার সুযোগ নেই। তথাপিও এ বিষয়ে গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন উক্ত অর্থ প্রাপ্তির জন্য আদালতে বিভিন্ন সময়ে শ্রম আদালতে মামলা দায়ের করে। মামলা চলমান থাকায় WPPF (অংশ গ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল) গঠন করা হয়নি। বিষয়টি কলকারখানা অধিদপ্তরে জানানো হয় যে, এ বিষয়ে মামলা চলমান রয়েছে। আদালত যে ভাবে সিদ্ধান্ত দিবে আমরা সে ভাবে ব্যবস্থা নেবো।

## আইনের বিধানঃ

শ্রম আইনের ২৩৬ ধারায় জরিমানা, অর্থ আদায়, ইত্যাদির প্রতিকারের বিধান দেয়া আছে। তাহা নিম্নরূপঃ

(১) যেক্ষেত্রে কোন কোম্পানী বা ট্রাষ্টিবোর্ড ধারা ২৩৪ এর বিধান সমূহ প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হয়। সে ক্ষেত্রে সরকার, আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি উল্লেখিত কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থানাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অনধিক ০১(এক) লক্ষ টাকা এবং অব্যাহত ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, ব্যর্থতার প্রথম তারিখের পর হইতে প্রত্যেক দিনের জন্য আরও ০৫(পাঁচ) হাজার টাকা করিয়া জরিমানা আরোপ করিয়া পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে জরিমানার মোট অর্থ পরিশোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে কোন ব্যক্তি উল্লেখিত বিধান পুনরায় লঙঘন করিলে বা প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে তাহার বিরুদ্ধে দ্বিগুন জরিমানা আরোপিত হইবে।

(৩) ধারা ২৩৪ এর অধীন প্রদেয় কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকিলে এবং এই ধারার অধীন আরোপিত জরিমানা Public Demand Recovery Act, 1913 এর বিধান অনুযায়ী আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) সংক্ষুদ্ধ কোন ব্যক্তি উহা পুন: বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট আদেশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবেন এবং সরকার উহা প্রাপ্তির পর অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি পুন:বিবেচনা করত: যথাযথ আদেশ প্রদান করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

**আমাদের মন্তব্যঃ** শ্রম আইনের ২৩৪ ধারার বিধান প্রতিপালন লংঘিত হইলে ২৩৬ ধারায় সরকার অনেক গুলি প্রতিকারের বিধান রেখেছে। ফলে ইহা কোন ভাবেই ফৌজদারী অপরাধ নহে। শ্রম আইন অনুযায়ী উহা প্রশাসনিক ও সিভিল মোকদ্দমার বিষয়।

প্রকৃত বিষয় এই যে, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর কর্তৃক ড. ইউনূসসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অভিযোগের ধারা ৪(৭)(৮), ১১৭ এবং ২৩৪ সমূহ হচ্ছে প্রশাসনিক কার্যধারা ও সিভিল অপরাধ। উপরোক্ত ধারা সমূহ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কোন লংঘন-ঘটলে শ্রম আইনে ৪(৮), ১১৭(৭) এবং ২৩৬ ধারায় উহাদের প্রতিকারের বিষয়গুলো উল্লেখ করা আছে। যখন শ্রম আইন স্বয়ং কোন ধারার লংঘনের প্রতিকারের বিধান রেখেছেন সেখানে কোন অবস্থায় আইনগত ভাবে উল্লেখিত ধারাগুলোর লংঘন ফৌজদারী অপরাধ নয়। কিন্তু উল্লেখিত অভিযোগের অানীত ধারা সমূহকে ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যে সকল ধারা ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য উহার বিশদ বর্ণনা বাংলাদেশ শ্রম আইনে উনবিংশ অধ্যায়ে অপরাধ, দন্ড এবং পদ্ধতি শিরোনামে উল্লেখ আছে। উক্ত উনবিংশ অধ্যায়ে এই মামলায় বর্ণিত ৪(৭)(৮), ১১৭ এবং ২৩৪ ধারা সমূহকে ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করে উহা সন্নিবেশিত করা হয় নাই। ইহাছাড়াও অত্র মামলার বাদী যিনি একজন লেবার ইন্সপেক্টর শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী বিবাদীদের বিরুদ্ধে তার মামলা দায়ের করার আইনগত কোন ক্ষমতা নাই। ধারা ৩১৯ (৫) অনুযায়ী উক্ত

মামলা দায়ের করার ক্ষমতা কেবলমাত্র মহাপরিদর্শককে দেয়া হয়েছে। অথবা মহাপরিদর্শকের নিকট হইতে তার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তা যদি ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তখন সে বাদী হিসাবে বিবাদীদের বিরুদ্ধে ফৌজাদরী মামলা দায়ের করতে পারবে। উপরোক্ত আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকা সত্তে¡ও বাদী মহাপরিদর্শকের অনুমতি ছাড়া অর্থাৎ মহাপরিদর্শকের অনুমতি পত্র ছাড়াই ৩১৯ (১) ধারায় নিজ ক্ষমতাবলে মামলা দায়ের করেছেন। অন্যদিকে শ্রম আইনের ৩১৩ (২) ধারায় আদালতের উপরও আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে যে তিনি মহাপরিদর্শক অথবা তাহার নিকট হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা ছাড়া কোন মামলা গ্রহণ করতে পারবেন না। আদালতের নথিপত্রে অত্র বিষয়ে কোন আদেশ লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।

উপরোক্ত বিষয় সমূহ বিস্তারিত ভাবে উল্লেখপূর্বক ফৌ: কা: বি: আইনের ২৪১-এ ধারায় বিবাদীদেরকে উক্ত মিথ্যা অভিযোগ হতে অব্যাহতি দানের প্রার্থনা করার পরও বিজ্ঞ লেবার কোর্ট বিবাদীদের অব্যাহতির প্রার্থনাটি নামঞ্জুর করে ৪(৭)(৮), ১১৭ এবং ২৩৪ ধারার অপরাধের অভিযোগ আমলে নিয়ে বিচারের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছেন। উপরোক্ত চার্জ অর্ডারের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে Quashment petition দাখিল করা হলে মাননীয় বিচারপতি জনাব রুহুল কুদ্দুস এবং বিচারপতি জনাব আশিস রঞ্জন দাস শ্রম আদালতের উক্ত চার্জ অর্ডারটিকে কেন বাতিল ঘোষণা করা হইবে না এই মর্মে রুল জারী করিলেও অপর পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য আপীল বিভাগ উহা শুনানীর জন্য রুল প্রদানকারী সিনিয়র কোর্টকে বাদ দিয়ে হাইকোর্টের অন্য একটি বেঞ্চ যে কোর্ট পূর্বের একই বিষয়ে একটি বিবাদীদের দায়েরকৃত Quashment মামলায় বিপক্ষে রায় দিয়েছিলেন সেই বিচারপতি জনাব মোঃ কুদ্দুস জামান ও বিচারপতি জনাব শাহেদ নূরউদ্দিন এর কোর্টে প্রেরণ করিলে উনারা পূর্বের Quashment মামলার রায়কে টেনে এনে শুনানীঅন্তে রুলটি ডিসচার্জ করলে মহামান্য আপীল বিভাগ বিবাদীদের পক্ষে দায়ের লীভ টু আপীল পিটিশনটি শুনানীকালে মেইনটেনেবিলিটির উপর অনেক সময় শুনানী করলেও মূল মামলার বিষয়ের শুনানীর জন্য মাত্র ১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেন। যাহা ছিল খুবই অপর্যাপ্ত। অত:পর লীভ পিটিশনটি ডিসমিস করে। আমাদেরকে পর্যাপ্ত সময় না দেওয়ার কারণে আমরা prejudice হয়েছি। যদি আপীল বিভাগ আমাদেরকে শুনানীর জন্য যদি পর্যাপ্ত সময় দিতো তাহলে আমরা মামলায় আনীত প্রকৃত বিষয় এই যে অভিযোগগুলো হচ্ছে প্রশাসনিক ও সিভিল বিষয় এবং ক্রিমিনাল বিষয় নয় এবং মামলা দায়েরের ক্ষেত্রেও আইনগত ত্রুটি এবং চার্জ অর্ডারের আইনগত ভুল ভ্রান্তি গুলো ব্যাখ্যা করতে পারলে আপীল বিভাগের রায় ও আদেশ ভিন্নতর হতে পারতো।

**দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত এজাহারঃ**

WPPF গ্রামীণ টেলিকমের জন্য প্রযোজ্য নয় জানা সত্তেও WPPF এর সুবিধা আদায়ের জন্য ২০১৭ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে গ্রামীণ টেলিকমের মোট ১০৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাংলাদেশ

শ্রম আইন ২০০৬ এর ২১৩ ধারার মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঢাকার ৩য় শ্রম আদালতে ১০৬ টি বিএলএ (আই, আর) মামলা এবং গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ২১১ ধারা মোতাবেক শিল্প বিরোধ মোকদ্দমা নং-১৬৬৬/২০১৯ দায়ের করেছে।

গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) শ্রম আদালতে তাদের দায়েরকৃত শিল্পবিরোধ মামলা নং- ১৬৬৬/২০১৯ এর বিষয় গোপন করত: গ্রামীণ টেলিকমের বিরুদ্ধে কোম্পানী আইনের ২৪১ এবং ২৪৫ ধারায় গত ০৪/০৪/২০২২ইং তারিখে হাইকোর্টের কোম্পানী কোর্টে Company Matters No. 271 of 2022 দায়ের করে গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানী অবলুপ্তির প্রার্থনা দায়ের করে এবং হাইকোর্টের কোম্পানী কোর্ট কর্তৃক মোকদ্দমাটি শুনানীর জন্য গৃহীত (Admitted) আদেশ আদায় করতে সক্ষম হয় এবং Provisional Liquidator নিয়োগের উদ্দেশ্যে "দৈনিক কালের কন্ঠ" এবং "দৈনিক অবজারভার" পত্রিকায় পরবর্তী ২ সপ্তাহের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অনুমতি লাভ করে।

যাহাহোক, মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত Company Matters No. 271 of 2022 এর ০৪/০৪/২০২২ইং তারিখের সার্টিফাইড কপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে বাংলাদেশের মাননীয় এ্যাটর্ণী জেনারেল জনাব এ.এম. আমিন উদ্দিন উক্ত Company matter মামলায় পিটিশনার শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) এর পক্ষে শুনানী করেন। সম্ভবত: উনার শুনানীর কারণেই হয়তো সিবিএ এর উক্ত Application টি Admit ও Provisional Liquidator (PL) নিয়োগের উদ্দেশ্যে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আদেশ প্রাপ্তি সহজ হয়েছে।

যাহাহোক, শ্রমিক-কর্মচারীগণ ও শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) কর্তৃক শ্রম অাদালতে দায়েরকৃত মামলা-মোকদ্দমা সমূহ বিজ্ঞ শ্রম আদালত ও মহামান্য হাইকোর্টে Company Matters No. 271 of 2022 এর ০৪/০৪/২০২২ইং তারিখের আদেশ ও নির্দেশনা দেখে গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃপক্ষের মনে ভীষণ ভয়-ভীতির সৃষ্টি হয় এবং অন্যদিকে কোম্পানী আইনের নিবন্ধিত ২৮ ধারায় নট ফর প্রফিট কোম্পানীর বিধানাবলীকে উপেক্ষা করে শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে WPPF দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শ্রম অধিদপ্তর ও আইন শৃংখলা সংস্থা সমূহের চাপের মুখে অর্থাৎ Under Duress এ পতিত হয়ে গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানী আইনের ১৯৯৪ এর ২৮ ধারায় গ্যারান্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ ও নট ফর প্রফিট কোম্পানী যার মুনাফা বিতরনযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও পারিপার্শিক অবস্থা ও বিরুপ পরিস্থিতির কারণে অনুন্যপায় হয়ে গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক-কর্মচারী ও সিবিএ এর সাথে amicable settlement out of court করার জন্য হাইকোর্টে Company matter No. 271 এ একটি যৌথ দরখাস্ত দাখিল করলে গত ২৩/০৫/২০২২ইং তারিখে হাইকোর্টের the Hon'ble Company Court passed the following order:

**“In view of the fact both the parties of the matter have amicable settled the dispute out of court, therefore, this court is of the view that there is no point of keeping this matter pending. As such, this court is inclined to dismiss the matter for non-prosecution.**

**Accordingly, the Company matter No. 271 of 2021 is dismissed on the ground of non-prosecution.”**

শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) এর সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক গ্রামীণ টেলিকম শ্রম আইন ২০০৬ এর ২৩৪ ধারার বিধান অনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে শুরু করে ২০২১-২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত net profit এর ৫% WPPF পাওনার ৯০% শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে ব্যাংক একাউন্টের মাধমেই অর্থ গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) এর সাথে সমঝোতায় সম্পাদিত Settlement Agreement এর আওতায় ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে। মোট সুবিধাভোগী ১৬৪ জনের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৫৬ জনকে তাদের প্রাপ্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে অবশিষ্ট ৮ জনের মধ্যে ৪ জন দেশের বাইরে এবং ৪ জন মারা যাওয়ার কারণে দেয়া হয়নি। তবে তাদের অংশ Settlement account এ রয়েছে, যা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রদান করা হবে। WPPF অর্থ পরিশোধের জন্য ৪৩৭,০১,১২,৬২১/- টাকা ব্যাংক হিসাবে প্রদান করা হয়েছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো থেকে জোরালো দাবী উত্থাপন করা হয়েছে যে শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন (সিবিএ) এর সাথে সমঝোতা Agreement সম্পন্ন করে উহার আওতায় গ্রামীণ টেলিকম WPPF এর অর্থ শ্রমিক-কর্মচারীদের নিকট সরাসরি বিতরণ করার কোন বিধান শ্রম আইন ২০০৬ এ নাই বিধায় WPPF এর উল্লেখিত বিতরণকে বে-আইনী ঘোষণা করেছে এবং গ্রামীণ টেলিকম এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী অপরাধ দায়ের প্রক্রিয়া চালু করেছে। গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃত ভাবে WPPF এর অর্থ বিতরণের পক্ষে ছিল না। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বিরুপ পরিস্থিতিসহ উল্লেখিত ভয়-ভীতির জন্য এবং Under Duress এর কারণে WPPF এর অর্থ বিতরণে বাধ্য হয়। যাহা গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানী আইনের ২৮ ধারায় গ্যারান্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ হওয়ায় শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে উক্ত WPPF  বিতরণ আইন সম্মত হয় নাই এবং গ্রামীণ টেলিকম বোর্ড মনে করে গ্রামীণ টেলিকম নট ফর প্রফিট কোম্পানী এবং ডিভিডেন্ড এর অর্থের উপর WPPF প্রযোজ্য নয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে গত ৩০ মে, ২০২৩ ইং তারিখে গ্রামীণ টেলিকম এর চেয়ারম্যান ড. প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসসহ আরও সাত জন বোর্ড মেম্বারদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে ২৫,২২,০৬,৭৮০/- আত্মসাতের অভিযোগ এনে বাংলাদেশ দন্ড বিধি আইনের ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা এবং মানিলন্ডারিং আইন, ২০১২ এর ৪(২)(৩) ধারায় মামলা নং-১২ দায়ের করে। মামলার এজাহারে বলা হয় ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ নাজমুল ইসলামসহ গ্রামীণ টেলিকম বোর্ডের সদস্যদের উপস্থিতিতে ২০২২ সালের ৯ মে গ্রামীণ টেলিকমের ১০৮ তম বোর্ড সভায় ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, গুলশান শাখায় একটি ব্যাংক একাউন্ট খোলার সিদ্ধান্ত হয়। তবে হিসাব খোলার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের একদিন আগেই ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়। এছাড়া গ্রামীণ টেলিকমের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাৎসরিক নীট মুনাফা WPPF এর ৫% পাওনা পরিশোধের নিমিত্তে গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক কর্মচারীদের সাথে ২৭ এপ্রিল ২০২২ ইং তারিখে সম্পাদিত Settlement Agreement এর মধ্যে ৯ মে তারিখের খোলা ব্যাংক একাউন্টটি দেখানো হয়েছে যা বাস্তবে অসম্ভব। এ রকম ভূয়া সেটেলমেন্ট এগ্রিমেন্টের শর্ত অনুযায়ী ও বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গ্রামীণ টেলিকম বিভিন্ন সময়ে উল্লেখিত ব্যাংক একাউন্টে ২৬ কোটি ২২ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ স্থানান্তর করে। কিন্তু কর্মচারীদের ৫% লভ্যাংশ বিতরণের আগেই তাদের প্রাপ্য অর্থ তাদেরকে না জানিয়ে আসামীরা আত্মসাৎ করেন। এজাহারে আরও বলা হয় এডভোকেট ফি হিসাবে প্রকৃত পক্ষে হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র ১(এক) কোটি টাকা। বাকী ২৫,২২,০৬,৭৮০/- গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বোর্ড সদস্যদের সহায়তার গ্রামীণ টেলিকমের সিবিএ নেতা এবং এডভোকেটসহ সংশ্লিষ্টরা জাতিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছে।

সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক এর অন্যতম শর্ত ছিল কর্মকর্তা কর্মচারীরা গ্রামীণ টেলিকম থেকে সম্মিলিত ভাবে ৪,৩৭,০১,১২,৬২১/- টাকা পাবে। পরবর্তীতে পুনরায় হিসাব করলে পূর্বের ভুল ধরা পড়ে যাহার সংশোধিত ও সঠিক হিসাব ৪,০৯,৬৯,২২,৭৮৯/- টাকা মর্মে সাব্যস্ত হয়। গ্রামীণ টেলিকম ও শ্রমিক ইউনিয়ন উক্ত হিসাব সঠিক মর্মে গ্রহণ করে। সমঝোতা চুক্তির শর্তানুযায়ী উক্ত টাকা, নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে হস্তান্তর করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন কোন ধরনের প্রমাণ ব্যতিরেকে উক্ত টাকা গ্রামীণ টেলিকম এর বোর্ড সদস্যরা আত্মসাৎ এর মাধ্যমে অবৈধ ভাবে লাভবান হয়েছেন বলে অভিযোগ দায়ের করেন। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত, কাল্পনিক ও সর্বৈব মিথ্যা।

"সমঝোতা চুক্তির" দুটি বিষয়কে উপজীব্য করে দুদক উক্ত অভিযোগ দায়ের করেছেন। প্রথমত: গ্রামীণ টেলিকম থেকে ১,৬৩,৯১,৩৮৯/- টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী সমঝোতার জন্য নির্ধারিত মোট টাকা ব্যাংক একাউন্টে হস্তান্তরের পর পুনঃ হিসাবের মাধ্যমে মোট প্রদেয় টাকার পরিমান কমে যায়। অর্থ গ্রহণের পূর্বে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাদের প্রাপ্য টাকা থেকে ৬% তাদের মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবীদের পেশাগত ফি ও বিবিধ খরচ বাবদ ইউনিয়নকে প্রদান করতে লিখিত অঙ্গীকার নামা প্রদান করে।

শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন মোট প্রদেয় ৪৩৭,০১,১২,৬২১/- টাকার স্থলে ৪০৯,৬৯,২২,৭৮৯/- টাকা মেনে নিলেও আইনজীবী ফি ও বিবিধ খরচ বাবদ পূর্বের হিসাবকৃত ৪৩৭,০১,১২,৬২১/- টাকার উপর দাবী করে এবং ৪০৯,৬৯,২২,৭৮৯/- টাকার উপর ৬% হিসাব করতে অস্বীকৃত জানায়। উক্ত সমস্যার উদ্ভব হলে গ্রামীণ টেলিকম কর্তৃপক্ষ নতুন করে আবার বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বিষয়টি বিতর্কের মাধ্যমে জিইয়ে রাখা কিংবা উক্ত বিষয়ে আবার আদালতের দ্বারস্থ হয়ে মূল্যবান সময় ও অর্থের অপচয় করা থেকে নিষ্কৃতির জন্য এবং উক্ত টাকা পূর্বের নির্ধারিত মোট প্রদেয় টাকার মধ্যে থাকায় উহা প্রদানে সম্মত হয়। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণে অর্থাৎ ব্যাংকের মাধ্যমে ও যাবতীয় বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে উক্ত টাকা হস্তান্তর করা হয়। এজাহারে বর্ণিত আছে ইউনিয়নের নেতারা উক্ত পরিমান টাকার কিয়দাংশ আইনজীবীদের প্রেরণ করে বাকি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। যদি এটি সত্য হয় তবে তা দুঃখজনক। কিন্তু গ্রামীণ টেলিকম এর চেয়ারম্যান বা বোর্ড মেম্বারদের উক্ত লেনদেনে দূরতম কোন সম্পর্ক ছিল না। কেন না উক্ত পরিমান টাকা সেটেলমেন্ট একাউন্ট থেকে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের লিখিত অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য অর্থ থেকে ইউনিয়ন এর একাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছিল এবং ইউনিয়ন এর একাউন্টে গ্রামীণ টেলিকম বা এর বোর্ড মেম্বারদের কোন কর্তৃত্ব নেই।

দুদক কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের দ্বিতীয় বিষয়টি হলো গ্রামীণ টেলিকম এর সাথে শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ২৭ এপ্রিল ২০২২ইং তারিখে। অন্যদিকে সমঝোতার চুক্তির মাধ্যমে দাবীকৃত অংশগ্রহণ তহবিলের টাকা প্রদানের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে ৮ মে, ২০২২ইং তারিখে। কিন্তু উক্ত একাউন্ট নম্বরটি সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তিতে উল্লেখ আছে। সুতরাং সমঝোতা চুক্তি পত্রটি ভূয়া ও জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে উক্ত টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

প্রকৃত সত্য হলো সমঝোতা চুক্তি ২৭ এপ্রিল, ২০২২ইং তারিখে কম্পিউটার কম্পোজের মাধ্যমে তৈরী ও উভয়পক্ষের স্বাক্ষরিত হলে ও ব্যাংক একাউন্ট নম্বর লিপিবদ্ধ করার জায়গা ফাঁকা রাখা ছিল। পরবর্তীতে ব্যাংক একাউন্ট খোলার পর উভয়পক্ষের সম্মতিতে তা হাতে লিখে সন্নিবেশন করা হয়। উক্ত ব্যাংক হিসাবটিতে গ্রামীণ টেলিকম এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং গ্রামীণ টেলিকম শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সিগনেটারী হিসেবে রাখা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে ৯ মে ২০২২ ইং তারিখে বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের পরই ব্যাংকে টাকা হস্তান্তর করা হয়। উভয় পক্ষের সম্মতিতে হাতে লিখে ব্যাংক হিসাব নম্বর সমঝোতা চুক্তিপত্রে সন্নিবেশন এর কারনে উহা আইনত: জাল বা ভূয়া বলে বিবেচিত হয়না। অন্যদিকে সমঝোতা চুক্তিটি চলমান কোম্পানী ম্যাটারের মামলায় জমা প্রদান করা হলে মাননীয় হাইকোর্ট বিনা প্রশ্নে সমঝোতা স্মারকটি আমলে নিয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করেছেন।

আবার দায়েরকৃত এজাহারের বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারনায় ' ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস এর নির্দেশে' কথাটি যুক্ত করা হয়েছে। অজ্ঞতা বা ভ্রান্ত ধারণা থেকে এটি বলা হয়েছে। কারণ গ্রামীণ টেলিকমের

যাবতীয় বিষয়াদি মিটিং এ আলোচনার মাধ্যমে বোর্ড সদস্যদের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত বা বর্জিত হয়।

**প্রফেসর ইউনূসের কর "ফাঁকি"?:**

প্রফেসর ইউনূসের আয়কর নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে যে আলাপ আলোচনা চলছে তার পুরোটাই প্রফেসর ইউনূসের অর্জিত টাকা। তার উপার্জনের সূত্র প্রধানতঃ তাঁর বক্তৃতার উপর প্রাপ্ত ফি, বই বিক্রি লব্ধ টাকা, এবং পুরস্কারের টাকা। এর প্রায় পুরো টাকাটাই বিদেশে অর্জিত টাকা। এই টাকা বৈধভাবে ব্যাংকিং চ্যানেলে আনীত। কর বিভাগ তা অবহিত আছে। কারণ সব টাকার হিসাব তাঁর আয়কর রিটার্নে উল্লেখ থাকে।

তিনি জীবনে কোনো সম্পদের মালিক হতে চাননি। তিনি মালিকানামুক্ত থাকতে চান। কোথাও তাঁর মালিকানায় কোন সম্পদ নেই (বাড়ি, গাড়ি, জমি, শেয়ার ইত্যাদি)। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর উপার্জনের টাকা দিয়ে তিনি দু'টি ট্রাস্ট গঠণ করবেন। তিনি তাই করলেন।

একটি ট্রাস্ট করলেন প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ট্রাস্ট এবং অল্প কিছু টাকা দিয়ে (মোট টাকার ৬%) উত্তরসূরীদের কল্যাণের জন্য করলেন ইউনূস ফ্যামিলি ট্রাস্ট। ফ্যামিলি ট্রাস্টের মূল দলিলে এই রূপ বিধান রেখে দিলেন যে তাঁর পরবর্তী এক প্রজন্ম পরে এই ট্রাস্টের অবশিষ্ট টাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল ট্রাস্টে ফিরে যাবে।

তিনি এটা করলেন যাতে তাঁর বর্তমানে এবং অবর্তমানে টাকাটা ট্রাস্টিদের তত্ত্বাবধানে নিরাপদে থাকে এবং তাঁরা ট্রাস্ট দুটির লক্ষ্য বাস্তবায়নে তৎপর থাকে।

তাঁর নিজের টাকা নিজের কাছে রেখে দিলে তাঁকে কম ট্যাক্স দিতে হতো। কারণ ব্যক্তিগত করের হার প্রতিষ্ঠানিক করের হারের চেয়ে কম। দানকরের প্রসঙ্গটি তুললেন তাঁর আইনজীবি।

আইনপরামর্শক বললেন, ট্রাস্ট গঠনের কারণে তাঁকে দানকর দিতে হবে না। কারণ বড় ট্রাস্টটি জনকল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত। ফ্যামিলি ট্রাস্টের ব্যাপারে তিনি পরামর্শ দিলেন যে এরকম ক্ষেত্রে (অর্থাৎ প্রফেসর ইউনূসের অবর্তমানে তাঁর সম্পদের কী হবে সে চিন্তায় যদি তিনি কোন ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন তবে সেক্ষেত্রে) তাঁকে কোনো কর দিতে হবেনা। কারণ এটা হবে তাঁর অর্জিত টাকার একটি সুব্যবস্থা করে যাওয়া। তাঁর পরামর্শের ভিত্তিতে টাকা স্থানান্তর করার সময় প্রফেসর ইউনূস কোন কর দেন নি। কিন্তু তিনি আয়কর রিটার্ন দাখিল করার পর কর বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানালেন যে, এক্ষেত্রে তাঁকে কর দিতে হবে । রিটার্নের যেখানে তিনি দানের তথ্যটি উল্লেখ করেছিলেন সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তা তার উপর দানকর ধার্য করে দিলেন। তিনি টাকার অংকটা রিটার্নস এ উল্লেখ করায় কর কর্মকর্তা তা দেখে কর আরোপ করেছেন।

আইন পরামর্শকের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রফেসর ইউনূস এ ব্যাপারে আদালতের সিদ্ধান্ত চাইলেন। আদালত কর দেবার পক্ষে মত দিয়েছে।

এই হলো মোট ঘটনা। এখানে তাঁর কর "ফাঁকি" দেবার কোনো প্রশ্নই নেই। কর দিতে হবে কিনা এব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকেই আদালতের সিদ্ধান্ত জানতে চাওয়া হয়েছিল। আদালতে সরকার যায়নি, প্রফেসর ইউনূস গিয়েছেন। কর বিভাগ কোনো পর্যায়ে বলে নি যে প্রফেসর ইউনূস কর ফাঁকি দিয়েছেন। এখানে কর ফাঁকি দেবার কোন প্রশ্ন উঠেনি। প্রশ্ন ছিল আইনের প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে। এখন প্রফেসর ইউনূস বিবেচনা করবেন তিনি কর পরিশোধ করবেন নাকি উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত চাইবেন। করের আইন যদি এক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য না-হয় প্রফেসর ইউনূস তাহলে সে-টাকাটা জনহিতকর কাজে ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন। এই হলো কর নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য, ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবার জন্য নয়।

**গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি'র পদ ঃ**

প্রফেসর ইউনূস কখনোই গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি পদ ধরে রাখার জন্য উৎসুক ছিলেন না। সরকারি ব্যাংকের মত এই ব্যাংকের এমডি'র জন্য কোন বয়স সীমা ছিল না।তিনি যতোবারই এই পদ ছেড়ে দিতে চাইছিলেন, প্রতিবারই পরিচালনা পরিষদের সদস্যরা তাঁকে ব্যাংক ছেড়ে চলে না যেতে অনুরোধ করছিলেন। ১৯৯০ সালে গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের শেয়ার ৬০শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয় এবং ঋণগ্রহীতাদের শেয়ার ৪০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ করা হয়। সংশোধিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়। ব্যাংকের সকল নিয়মনীতি তৈরীর ক্ষমতা পরিচালনা পরিষদকে দেয়া হয়। তেরো সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদে চেয়ারম্যানসহ তিন জন সদস্য নিয়োগ দেয়া ছাড়া আর কোনো ক্ষমতাই সরকারের কাছে রাখা হয়নি। সরকারী চাকুরী বিধি অনুসরণ করার কোনো বাধ্যবাধকতা গ্রামীণ ব্যাংকে রাখা হয়নি। অন্যান্য ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকের মতো ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিয়োগ দেবার ক্ষমতা রাখা হয়েছিল বোর্ডের কাছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ বা তার শর্তাবলী ধার্য করার ক্ষমতা মন্ত্রণালয়ের কাছে রাখা হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক অবসরে যাবার বয়সের প্রশ্ন তুলে প্রফেসর ইউনূসকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেয় ২০১১ সালে। প্রফেসর ইউনূসকে এমডি'র পদ থেকে যখন সরানো হয়, তখন গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের মালিকানা ছিল ৯৭% আর সরকারের ছিল ৩%। এ সময়ে প্রফেসর ইউনূস হাইকোর্র্টে রিট পিটিশন দাখিল করেন। হাইকোর্ট শুনানির জন্য তাঁর রীট আবেদন এই মর্মে প্রত্যাখান করেন যে, এই পিটিশন দাখিলযোগ্য নয়, অর্থাৎ আইনের ভাষায় এটা দাখিল করার লোকাস স্ট্যান্ডি তাঁর নেই। এরপর তিনি আপীল বিভাগের নিকট আপীল করেন এবং আপীল বিভাগও একই মর্মে তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। প্রফেসর ইউনূস আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে অবিলম্বে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে সরে দাঁড়ান।

**উপসংহারঃ**

উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোনরূপ তথ্য প্রমাণ ব্যতিরেকে মামলাটি গ্রামীণ টেলিকম এর চেয়ারম্যান ও বোর্ড সদস্যদের দীর্ঘদিনের অর্জিত সুনামে কালিমা লেপনের জন্যই দায়ের করা হয়েছে। সুতরাং একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে গ্রামীণ টেলিকম এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস ও বোর্ড মেম্বারদের ব্যতিব্যস্ত রাখার মাধ্যমে তাদের কর্তৃক পরিচালিত জনকল্যাণমূলক কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করার মাধ্যমে তাদের ভাব মূর্তি ক্ষুন্ন করার অপপ্রয়াস মাত্র।